Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-3 Issue-1 July 2024

চৈত্রাবসান এবং রবীন্দ্র-চেতনালোক

দীনবন্ধু মণ্ডল

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2024/08/14_Dinabondhu-mondal.pdf

সারসংক্ষেপ: প্রকৃতি-পূজারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে দেখা যায় শান্তিনিকেতনে প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-ই নিয়ে এসেছেন। শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠানের মাঝেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির নানা রূপকে খুঁজে পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ, বর্ষবরণ, বর্ষামঙ্গল, হলকর্ষণ, শারদ উৎসব, বসন্ত উৎসব, পৌষ উৎসব, মাঘোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রকৃতির নানা রূপের-ই সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতির রূপ বর্ষশেষ অর্থাৎ চৈত্রাবসান। রবীন্দ্রনাথ বর্ষশেষ-কে ভীষণ উপলব্ধি করতেন। তাই তাঁর সাহিত্যে বারে বারে নতুন ভঙ্গিমায় আমরা এই উপলব্ধি করেছি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে কীভাবে বর্ষশেষ বা চৈত্রাবসানের আনন্দ ছড়িয়ে আছে তার-ই চিত্র ফুটিয়ে তোলা এই প্রবন্ধের লক্ষ।

সূচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, বর্ষশেষ, বর্ষবরণ, চৈত্রাবসান, জন্মদিন, কবিতা, প্রকৃতি

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষশেষ' কবিতায় বলেছেন —

"মানুষ আনন্দহীন নিশিদিন ধরি
আপনারে ভাগ করে শতভাগ করি।"[১]

যে মানুষটি সারা জীবন জুড়ে নিজের জীবনে, সাহিত্যে অখণ্ডতার সাধনা করে গিয়েছেন এবং আনন্দকেই সর্বোত্তম প্রাপ্তি বলে জেনেছেন তিনি আর পাঁচজনের থেকে চৈত্রাবসানকে, বর্ষশেষকে নতুন ভাবে, নতুন ভঙ্গিমায় দেখবেন এবং ভাববেন সেই সঙ্গে ভাবাবেনও এটাই কাঙ্খিত এবং প্রার্থিত। চৈত্রের অবসান যা বাংলা বর্ষের বর্ষশেষ সূচক তা প্রকৃতিরই এক অচ্ছেদ্য অংশ। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রকৃতির আবেদন ছিল সব থেকে বড়ো। আমরা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ, পল্লী সংগঠক রবীন্দ্রনাথ, পিতা রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ যাঁকেই খুঁজতে যাই না কেন তাঁর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ছিল আত্মিক এবং নিবিড়। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্র-প্রতিকৃতিকে ভাবাই যায় না। তাঁর শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন আর কিছুই নয়, আসলে প্রকৃতি চিন্তারই চরম পরাকাষ্ঠা স্বরূপ। শান্তিনিকেতনে প্রকৃতি এসেছে বর্ষশেষ, বর্ষবরণ, বর্ষামঙ্গল, হলকর্ষণ, শারদ উৎসব, বসন্ত উৎসব, পৌষ উৎসব, মাঘোৎসব প্রভৃতি পর্ব থেকে পর্বান্তরের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানের মূলে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির মাঝে অনুষ্ঠান — এই দুই একাকার হয়ে গিয়েছিল শান্তিনিকেতন আশ্রমে, যার মধ্যমণি পথপ্রদর্শক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারই এক তাৎপর্যবাহী অঙ্গ বা অনুষ্ঠান হলো বর্ষশেষ।

বর্ষশেষ এবং বর্ষবরণ — এ দুই-ই হলো একই ভাবনার এপিঠ এবং ওপিঠ। এদের ভাগ করা কঠিন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনে, সাহিত্যে — এই দুই-কে আলাদা আলাদা তাৎপর্যবাহী অংশ রূপে দেখিয়েছেন, সূক্ষ্ম বিচারে এদের পৃথক পৃথক গুরুত্বকে বুঝিয়েছেন। রবীন্দ্র চেতনালোকে চৈত্রাবসান যে চেতনা প্রবাহ রেখে গিয়েছে তার প্রকাশ আমরা লক্ষ করব রবীন্দ্র-সাহিত্যে এবং রবীন্দ্র-জীবনে। রবীন্দ্রসাহিত্যের মূলত দুই ক্ষেত্রে বর্ষশেষ ভাবনার প্রকাশ এবং প্রবাহ লক্ষ করা যায়। সেই দুই ক্ষেত্র হলো রবীন্দ্র-কবিতা এবং রবীন্দ্র-প্রবন্ধ। এর বাইরেও আমরা বর্ষশেষ ভাবনার প্রকাশ রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যান্য অংশে অল্পবিস্তর প্রকাশ দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের আজকের অন্বেষণ রবীন্দ্র-কবিতা এবং প্রবন্ধ নিয়ে-ই থাকবে।

রবীন্দ্র-কবিতার সূচনাকাল থেকে একেবারে অন্তিম পর্ব পর্যন্ত নানাভাবে, নানা ভাষায় বর্ষশেষের ভাবনা ঘুরেফিরে এসেছে

আমরা দেখব, 'কল্পনা' (১৯০০) কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষশেষ' কবিতা, 'চৈতালি' (১৯১২) কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষশেষ' ও 'অভয়' কবিতা, 'পরিশেষ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষশেষ' কবিতা, 'বীথিকা' (১৯৩৪) কাব্যগ্রন্থের 'অভ্যুদয়' কবিতা এবং একেবারে শেষ পর্যায়ের কাব্য 'জন্মদিনে'র (১৯৪১) ১২ নম্বর কবিতায় চৈত্রাবসান চিন্তার সাহিত্য অভিব্যক্তি ঘটেছে। সেই সঙ্গে উল্লেখ্য, বর্ষশেষ নামাঙ্কিত প্রবন্ধ এই সময়ের বেশ কিছু পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল যেগুলি পরবর্তীকালে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রবন্ধমালায়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৩০৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বর্ষশেষ' প্রবন্ধ এবং ওই একই পত্রিকায় ১৩২১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বর্ষশেষ' নামাঙ্কিত প্রবন্ধের প্রকাশ হয়েছিল। এরপর 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'বর্ষশেষ' নামে প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছিল। এছাড়া শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালার ১ থেকে ১০ সংখ্যক বক্তৃতার মধ্যে 'বর্ষশেষ' নামাঙ্কিত প্রবন্ধ এবং শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালার ১১ থেকে ১৭ সংখ্যক বক্তৃতায় 'বর্ষশেষ' নামে আর এক প্রবন্ধের উল্লেখ আমরা পাই। আমরা লক্ষ করব, বর্ষশেষ নিয়ে প্রবন্ধ এবং কবিতা সেই সঙ্গে বর্ষশেষকে নিয়ে অনুষ্ঠান সবটাই শুরু হয়েছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকে।

প্রথমে আমাদের অভিনিবেশ থাকবে কবিতার পরিসরে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ষশেষকে কীভাবে দেখেছেন — সেই দিকটির প্রতি। একটা বিষয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বত্র চৈত্রাবসান বলতে ৩০ চৈত্রকেই সূচক হিসাবে ধরেছেন। কবি 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষশেষ' কবিতায় এক ঝড়ের রাতের কথা উল্লেখ করেছেন। কাব্যের ভাষায় কবি ব্যক্ত করেছেন —

"বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন
চৈত্র অবসান —
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান।"[২]

বর্ষের শেষের দিনে ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে কবি নিজের অন্তরকে, আত্মলোককে অনুসন্ধানে নিমগ্ন থেকেছেন। কবি নিজেকে প্রস্তুত রেখেছেন এইভাবে, যদি কোনো বাধা আসে তাহলে তার থেকে তিনি নিজে বিমুখ না করেন যেন; বাধা কবিকে পিছনে ফেলে না দেয় যেন কখনো। এই অঙ্গীকার, এই আত্ম উদ্বোধন কবির মধ্যে উদয় হয়েছে বর্ষশেষের সেই চৈত্রের ক্ষণে। বর্ষশেষ যেন কেবলমাত্র জীবনের লাভ, ক্ষতি, কলহ, সংশয় — এই নিয়ে যোগ বিয়োগেই শেষ হয়ে না যায়, চৈত্রাবসান খণ্ডতার প্রতীক হয়ে যেন না থাকে। তাই কবি অখণ্ডের কথা, অনন্তের কথা উল্লেখ করেছেন বর্ষশেষের সেই মাহেন্দ্র ক্ষণে। কবির ভাষায় —

"হে নূতন এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে।"[৩]

'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষশেষ' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরেক অন্য অনুভবের কথা, অন্য সত্যের কথা উন্মোচিত করেছেন। একদিকে মনুষ্য-সমাজ বর্ষশেষের মূর্ছনায় মূর্ছিত, বেদনার্ত অন্যদিকে প্রকৃতির মাঝে পাখিদের কাকলিতে, কলতানের আনন্দে উত্তাল। মানুষের মধ্যে খণ্ডের বেদনা আর প্রকৃতির মধ্যে অখণ্ডের সাধনাকে কবি খুঁজে পেয়েছিলেন পাখিদের মধ্যে আনন্দের রোশনাই মধ্য দিয়ে। এই দুইয়ের সহাবস্থানে রচিত হয়েছে কবিতাটি। কবি বলেছেন —

"পাখিরা জানে না কেহ আজি বর্ষশেষ,
বকবৃন্ধ কাছে নাহি শুনে উপদেশ।
যতদিন এ আকাশে এ জীবন আছে,
বরষের শেষ নাহি তাহাদের কাছে।
মানুষ আনন্দহীন নিশিদিন ধরি,
আপনারে ভাগ করে শতভাগ করি।"[৪]

কবি নিজের উপলব্ধিকে, সত্যরূপকে শিল্পরূপ দান করেছেন এই কবিতায় অনবদ্য ভাষায়। মানুষ খণ্ড, বিশ্বপ্রকৃতি অখণ্ড — এই বোধ, এই চেতনা বর্ষশেষের ভাবনাকে অভিনব শিল্পরূপ প্রদান করেছে এই কবিতায়।

'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষশেষ' কবিতায় কবি বর্ষের শেষের সঙ্গে জীবনের শেষকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে মূল্যায়ন করেছেন। এবং কবি শেষের মধ্যে অশেষকে, অন্তিমের মধ্যে অনন্তকে, বিষাদের মধ্যে আনন্দকে, গণ্ডির মধ্যে অসীমকে খুঁজে পেয়েছেন। পূর্ণতাকে কবি খুঁজে পেয়েছেন জ্ঞানে, কর্মে, ভাবে। তাই বর্ষশেষ কবির কাছে কোনো বেদনার বার্তা নিয়ে আসেনি

বরং পরিপূর্ণতার প্রতীক হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বর্ষশেষ কবির অন্তরে অন্য এক চেতনার উদয় ঘটিয়েছে। তাই কবি বলেছেন —

"আজি এই বৎসরের বিদায়ের শেষ আয়োজন —
মৃত্যু, তুমি ঘোচাও গুণ্ঠন।
কত কি গিয়েছে ঝরে — জানি জানি, কত স্নেহ প্রীতি
নিবায়ে গিয়েছে দীপ, রাখে নাই স্মৃতি।
মৃত্যু, তব হাত পূর্ণ জীবনের মৃত্যুহীন ক্ষণে
ওগো শেষ, অশেষের ধনে।"[৫]

আবার কাব্যের আধারে, কবিতায় বর্ষকে কবি চরম শক্তিধর বলে উল্লেখ করেছেন অথচ এই শক্তির প্রকাশ নীরবে এবং নিভৃতে ঘটে চলে। কবি বর্ষের উদ্দেশ্যে বলেছেন —

"নাই অস্ত্র, নাই সৈন্যদল
অস্ফুট তাহার বাণী, কণ্ঠে নাহি বল।"[৬]

এই কবিতায় কবি বর্ষের বলবীর্য রূপকে তুলে ধরেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের একেবারে অন্তিম পর্বের কাব্য হলো 'জন্মদিনে'। এই কাব্যটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কবির চিন্তন মননের সঙ্গে বর্ষশেষের বিষয়টি কীভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। তাই বেলাশেষেও কবি বর্ষশেষের ভাব গাম্ভীর্য নিয়ে বিস্মৃত হননি। কবির ভাষায় সেই সত্য উঠে এসেছে —

"মন বলে, আমি চলিলাম,
রেখে যাই আমার প্রণাম,
তাঁদের উদ্দেশ্যে যাঁরা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো।"[৭]

কবিতার আয়তক্ষেত্রে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ষশেষকে নানা বৈভবে, নানা বৈচিত্র্যতায় আবিষ্কার করেছেন; তার স্বরূপকে নানা রূপে উপস্থাপন করেছেন।

আমরা চলে আসছি রবীন্দ্র-প্রবন্ধের আলোচনায়। রবীন্দ্র প্রবন্ধের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আমরা বর্ষশেষ বন্দনার কথা প্রকাশ লক্ষ করব। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৩০৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বর্ষশেষ নিয়ে যে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন সেখানে তিনি বর্ষশেষকে এক জাগরণের পর্যায় রূপে আলোচনা করেছেন। বর্ষশেষ এখানে কোনো বিষাদের বার্তাবহ হয়ে থাকেনি বরং থেকেছে চৈতন্যের জাগরুক হিসেবে। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, প্রার্থনা করেছেন —

"এই বর্ষশেষের শুভ সন্ধ্যায় হে নাথ, তোমার ক্ষমা মস্তকে লইয়া সকলকে ক্ষমা করি, তোমার প্রেম হৃদয়ে অনুভব করিয়া সকলকে প্রীতি করি, তোমার মঙ্গালভাব ধ্যান করিয়া সকলের মঙ্গাল কামনা করি। আগামী বর্ষে যেন ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করি, বীর্যের সহিত কর্ম করি, আশার সহিত প্রতীক্ষা করি, আনন্দের সহিত ত্যাগ করি এবং ভক্তির সহিত সর্বদা সর্বত্র সঞ্চরণ করি। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম।"[৮]

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৩২১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তিনি 'বর্ষশেষ' নামে আরো একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ষের প্রাথমিক বেদনার গভীরে লুকিয়ে থাকা অনন্ত সম্ভাবনার কথা, নিত্য উত্তরণের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছে, বর্ষশেষ যে বেদনা আনে তাই নববর্ষের আনন্দকে ঘনীভূত করে, এক নতুন পর্যায়কে সূচিত করে। তাই বর্ষশেষ তাঁর দৃষ্টিতে আত্মোপলব্ধির, জাগরণের এক ইতিহাস হয়ে থাকে। বর্ষশেষের ক্ষণিকের দুঃখে নিহিত থাকে অনন্তের আনন্দ, নতুন এক উদ্বোধন। প্রবন্ধটি শেষ করেছেন তিনি চার পংক্তির কবিতার চরণ দিয়ে। সেখানে তিনি বলেছেন —

"মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছে,
তোমায় করি গো নমস্কার।"[৯]

'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ষশেষের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে আর এক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন চৈত্রের শেষের এক ঝড়ের রাত্রে। প্রবন্ধে সেই ঝড়ের কথা উল্লেখ করে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ঝড় আসলে আমাদের জীবনের একঘেয়েমিতাকে দূর করে, জীবনকে নতুন পথের পথিক করে তোলে। অমৃতের অনুসন্ধান, অসীমের সংস্পর্শ কবি সেই দিনে অনুভব করেছিলেন। তারই স্বরূপ সন্ধান করেছেন নব নব রূপে, নব নব ভাবে। এই প্রবন্ধে সেই সত্যের প্রকাশ ঘটেছে —

"উপনিষদের আনন্দ রূপের এই প্রকাশকে তিন দিক থেকে দেখেছেন। বিশ্বপ্রকৃতিতে, লোকালয়ু আত্মায়। বিশ্বপ্রকৃতিতে তিনি শান্তম লোকালয়ে শিবম আত্মায় অদ্বৈতম। এই তিন ভাবের মধ্যে দেখতে পাই সংযম, যাকে বলেছি বৈরাগ্য। বিশ্বপ্রকৃতিতে নানা শক্তির যে আন্দোলন চলেছে তাতে আকাশ ব্যাপ্ত করে প্রলয়ের সংঘাত আনছে না তো। সকল প্রকার গতির মধ্যে শান্তিকেই দেখছি। তার কারণ পরস্পরের মধ্যে পরিনাম রক্ষা হচ্ছে।"[১০]

তিনি এখানে উপনিষদের সঙ্গে জীবনকে এবং জীবনের সঙ্গে উপনিষদকে একাকার করে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। বর্ষশেষ তাঁর এই উপনিষদ নির্ভর জীবনচিন্তার অভিব্যক্তিকে দ্যোতনাময় করে, বাঙ্ময় রূপে প্রকাশ করে অনন্তের সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েছে। শান্তিনিকেতন ভাষণ-মালার দুটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন বর্ষশেষ বিষাদের নয়, একটা পূর্ণতার প্রতীক। যেমন মৃত্যুতে জীবনের ছেদ নয়, আসলে জীবনের মূল্যায়ন ঘটায়। এখানে এই প্রবন্ধ মালায় তিনি বর্ষশেষের আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছুর মূলে পরম শক্তিময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন —

"যখন খেলায় খুব করে মেতেছিলুম তখন খেলাই আমার কাছে খেলার সঙ্গীর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল, তখন তোমাকে তেমন করে দেখা হয়নি। আজ যখন একটা খেলা শেষ হয়ে এলো তখন তোমাকে ধরেছি, তোমাকে চিনেছি।"[১১]

বর্ষশেষ এবং বর্ষবরণ রবীন্দ্র-জীবনাদর্শ, রবীন্দ্র-সাহিত্য ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিল, নিবিড় ভাবে আবদ্ধ ছিল। বর্ষশেষকে ঘিরে তাঁর এক কল্যাণচিন্তক মন, মঙ্গলচিন্তক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। বিশিষ্ট আশ্রমিক, রবীন্দ্র অনুরাগী ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে গুরুদেবের ব্যক্তি জীবনের এক বিশিষ্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্য দিয়ে বর্ষশেষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড়তার, আত্মিক যোগের কথা প্রকাশ পায়। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২০ সালে। মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গুজরাট সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই সভায় উপস্থিত থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনজনকে সঙ্গী করেছিলেন, তাঁরা হলেন — দীনবন্ধু এন্ড্রুজ, বন্ধুবর সন্তোষ মজুমদার এবং ক্ষিতিমোহন সেন। গুজরাটে উপস্থিত হওয়ার পর সেখানকার সাহিত্য পরিষদের একদিনের সান্ধ্য সভায় এন্ড্রুজ সাহেবকে বলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সময়টা ছিল এপ্রিল মাস। একদিকে গুজরাট অন্যদিকে এপ্রিল মাসের চরম গরম। উক্ত সভায় যাওয়ার সময় পথের দু'ধারে উপস্থিত প্রত্যেক মানুষজন গুরুদেবকে দেখার জন্য ভিড় করেছিলেন এবং গুজরাটি আপ্যায়নের রীতি অনুসারে ভাং মেশানো সরবত বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন গুরুদেবের দিকে। সেখানে উপস্থিত প্রাণজীবন মহাশয়ের সাবধান বাণী শুনে গুরুদেব, সন্তোষ মজুমদার এবং ক্ষিতিমোহন সেন ভাং মেশানো শরবত খাওয়া থেকে বিরত থাকলেও ভাং-এর বিষয়টি গভীরভাবে না জানার কারণে এন্ড্রুজ সাহেব কয়েক গ্লাস ভাং সরবত পান করেন এবং সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। ফলস্বরূপ এন্ড্রুজ সাহেবের স্থলাভিষিক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সেদিনের সভায় বক্তৃতা প্রদান করতে হয়েছিল। এই সভায় বক্তব্য রাখার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎই তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছিল বর্ষশেষ নিয়ে। সেখানে যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন তার থেকে বোঝা যায় এগুলি তাঁর সাজানো-গোছানো, মঞ্চ উপস্থাপনার জন্য কথা ছিল না; একেবারেই মনের কথা, অন্তরের কথা ছিল। এই কথাগুলি বলে দেয় বর্ষশেষ রবীন্দ্রনাথের মনের মণিকোঠায় কীভাবে মণিময় থাকত সব সময়ের জন্য। সেই বক্তব্যের কিছুটা অংশ হলো —

"পৃথিবী একবার সূর্যকে ঘুরে এলো। পৃথিবীর নব বৎসর বলতে পারি। আমাদের তাতে কী? পৃথিবী আপন কক্ষে ঘোরে, তাই দিন হয়, রাত হয়। তাতে আমাদের দিনরাত্রি হবে কী করে। আমরা সাধনাহীন, আমরা আলোকহীন, আমাদের নেই দিন, নেই রাত্রি, নেই বৎসর, নেই নববর্ষ। পৃথিবী একবার সূর্য পরিক্রমা শেষ করলো বটে, কিন্তু আমরা কোন কল্যাণ পরিক্রমা শেষ করলাম, কোন নব কল্যাণের পরিক্রমা আরম্ভ করলাম ? অথচ চরাচরের মধ্যে নাকি মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ তার বুদ্ধি আছে, চেতনা আছে, আত্মা আছে। এই পৃথিবীর সেসব কিছু নেই, সে তো শুধু মাটির পিণ্ড। তবু তার সত্যিই একটি পরিক্রমা শেষ হয়েছে এবং তার নববর্ষ আরম্ভ হয়েছে। আমার তো কিছুই হয়নি, যদিও আমি মানুষ।"[১২]

এই বক্তৃতার শেষে তিনি যে কথাগুলি বলেছেন, যা রবীন্দ্র-চেতনালোককে জানতে এবং বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। বক্তৃতা শেষে তিনি বলেছেন —

"এমন সাধনা, এমন একাগ্রতা কবে পাবো সেই দীক্ষা দাও। মানব কল্যাণের এক পরিক্রমা শেষ করে আর এক পরিক্রমা যদি শুরু করতে পারি তবেই তো তাকে নববর্ষ বলব, নইলে তার নববর্ষ কিসের? হায় হায় এ মাটির পৃথিবীও নববর্ষ পেল, পাইনি শুধু আমরা মানুষ।"[১৩]

বর্ষশেষ রবীন্দ্রনাথের কাছে কোনো কালানুক্রমিক বস্তু ছিল না। তিনি বর্ষশেষকে কেবলমাত্র বাইরের বস্তু হিসাবে দেখেননি। এর মধ্যে মানব জীবনের, জগত সংসারের মূল সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, জীবনের কল্যাণবোধের আদর্শকে নিহিত থাকতে দেখেছেন। সামগ্রিক বিচারে, বর্ষশেষ রবীন্দ্রসৃজনের একটা পর্যায় হয়ে রাবীন্দ্রিক-মহিমা লাভ করেছে।

চৈত্রাবসান রবীন্দ্র-চেতনালোকে, তাঁর সাহিত্য প্রবাহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এক অনুষঙ্গ, যা রবীন্দ্র চেতনালোকের স্বরূপকে জানতে সাহায্য করে। এর মধ্যে তিনি সেই অখণ্ডতার বোধকে উপলব্ধি করেছিলেন, যা তিনি নিজে যেমন জেনেছেন তেমনি জানিয়েছেন সকলকে। তাই তাঁর অতলান্ত প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে বর্ষশেষ কোনো বিষাদের বার্তা নিয়ে আসেনি, নিয়ে এসেছে চির আনন্দের মহিমাকে। কবি রবীন্দ্রনাথ আজীবন সুদূরের পিয়াসী, নূতনের পিয়াসী ছিলেন। তাই বলে পুরাতনকে তিনি কখনো অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করেননি। আর বর্ষশেষ তার-ই সূচক হিসাবে উপস্থিত থেকেছে। প্রকৃতির মধ্যে যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম'কে খুঁজে পেয়েছিলেন, বর্ষশেষের দিনে তাকেই উপলব্ধি করেছিলেন। সবথেকে বড়ো কথা হলো, বর্ষশেষের মধ্যেও তিনি উপনিষদের সেই সর্বব্যাপী বাণীকে খুঁজে পেয়েছিলেন, উপলব্ধি করেছেন এক এবং অদ্বিতীয়ের। এখানেই বর্ষশেষ রবীন্দ্র চিন্তন-মননের মূল প্রবাহের সঙ্গী হিসাবে বর্তমান থেকে রবীন্দ্র চেতনালোকের স্বরূপ উদঘাটনে সহায়ক হয়ে বর্তমান থেকেছে।

তথ্যসূত্র:

১। 'বর্ষশেষ' কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৩৫ (অতঃপর 'রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড' নামে উল্লিখিত)

২। 'বর্ষশেষ' কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ১৫২

৩। ওই, পৃ. ১৫৩

৪। 'রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড', পৃ. ৩৫

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বর্ষশেষ' কবিতা, 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ১৩৪

৬। ওই, পৃ. ১৩৪

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১২'কবিতা, 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৬৮

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বর্ষশেষ' প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৪৮১

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বর্ষশেষ' প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ২২৯

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বর্ষশেষ' প্রবন্ধ, ' শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য় প্রকাশিত, বৈশাখ ১৩৩২ সংখ্যা, পৃ. ১২৫

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বর্ষশেষ' প্রবন্ধ, শান্তিনিকেতন ভাষণমালার অন্তর্গত, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৬৭৫

১২। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন — ক্ষিতিমোহন সেন', প্রণতি মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পুনশ্চ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১০৪

লেখক পরিচিতি: দীনবন্ধু মণ্ডল, সহকারি অধ্যাপক, কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ